

# গ্রামীণ ভাবনা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

আমাদের এই ক্ষুদ্র মানব-জীবনে বৈপরীত্যের এত ছড়াছড়ি যে ভাবলে অবাক হতে হয়। শহর ও গ্রাম নিয়ে মানুষের ভাবনা যে কখন কোন পথে ছুটবে, তার ঠিক নেই। গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা, ছিটকে পড়া মানুষই শহর গড়েছে। শহর পানে ছুটেছে। শহরের প্রতি ভালবাসায় ছোটেনি। ছুটেছে জীবিকার সন্ধানে। একটা সময় ছিল আমাদের এই বাংলাদেশে, যখন চাকরিজীবী মানুষ, কর্মজীবনের অন্তে, আবার ফিরে এসেছে পিতৃপুরুষের ভিটেয়। সারা কর্মজীবন কেটেছে শহরে, নানা শহরে। কিন্তু শহরকে কখনও আপন মনে হয়নি। অবশ্য গ্রামকে পছন্দ করার কারণও ছিল; পৈতৃক জ্যোতজমা, বাগানের ফল, নদী বিলবিলের টাটকা তাজা মাছ, খাঁটি দুধ, খাঁটি সর্ষের তেল-কী নয়। তবে কালে কালে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, মানুষ শহরের বাসাকে বাড়িতে রূপান্তরিত করেছে, শহরের শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগকে মূল্য দিতে শিখেছে। একই পরিবারের একটি অংশ হয়েছে নগরবাসী, অন্য এক অংশ আঁকড়ে ধরে আছে গ্রামের ভিটে, গ্রামের খেতখামার, গ্রামের টিমে-তালের জীবনযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ কেন শহর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেও কেবলই গ্রামের দিকে পলায়নপর ছিলেন, তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন তাঁর চিঠিতে, তাঁর ছিন্নপত্রে। শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রামের বাড়িতেই থেকেছেন, যদিও কলকাতায় একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তবে এ কালে এসে আমরা আর পল্লীবাসী কবি বা ঔপন্যাসিক দেখতে পাচ্ছি। কারণটা কী?

সাদামাটাভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে শহর-গ্রামের প্রতিযোগিতায়। শহর জিতে গেছে, গ্রামের পরাজয় হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো এই যে, নগর-জীবনে স্বস্তি নেই, আছে কোলাহল, যানজট, ভেজাল খাদ্য-পানীয়, আছে দূষিত বাতাস, আছে সন্ত্রাসীর হাতে বেঘোরে মারা যাওয়ার ভয়; বস্তিবাসীদের জীবনের দুঃসহ গ্লানির কথা নাইবা বললাম। এর বিপরীতে গ্রামে আছে দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, জমিজমা-সম্পত্তি নিয়ে খিটিমিটি-বিবাদ-মামলা-মোকদ্দমা। গ্রামে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে এদের ব্যর্থতায়, হতাশায়। এরা অনেক আশা নিয়ে শহরে ছোটো, ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসে।

গ্রামে গিয়েছিলাম। যেহেতু গ্রামের ছেলে, এবং গ্রামে একটা ভিটেবাড়ি আছে, তাই মনটা সবসময় পড়ে থাকে ফেলে আসা গ্রামে। চাকরি-জীবনের শেষে, অবসরপ্রাপ্ত আমি এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম, প্রতি মাসে সপ্তাহখানেকের মতো গ্রামের বাড়িতে থাকব। আমার সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। আমার নগরবাসী বন্ধুরা তাদের বিস্ময় প্রকাশ করেছিল—একি উদ্ভট কল্পনা!

জোট সরকারের তিন বছর পূর্তির দিন ঢাকায় অনেক উত্তেজনার ঘটনা ঘটবে। সারা দিনের হরতাল আছে, অতএব এটাই শহর ছেড়ে পলায়নের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করলাম আমরা দু'ভাই। যথা ইচ্ছা তথা কাজ। একটু ধন্দে ফেলে দিয়েছিল হঠাৎ ফিরে আসা বঙ্গোপসাগরের নিমচাপ। তিন দিনের অব্যবস্থার ব্যর্থতা। তবে যে দিনটিকে নিয়ে দু'ধরনের উত্তেজনা তার ঠিক আগের দিন দুর্ঘোণ কেটে গেল। আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন। শরতের আলোয় ভুবন ভরে গেল, আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। কী আনন্দ!

নটাখোলা ঘাটে এসে মনে হলো, কেন যে পদ্মা সেতু নিয়ে এত টেঁচামেচি করার পরও নটাখোলা হেরে গেল মাওয়ার কাছে, আর আমাদের এই ফেরি পারাপারের বিড়ম্বনা নিয়ে চলতে হচ্ছে, কতদিন চলতে হবে, কে জানে! ভালর মধ্যে দেখলাম, ঘাটের এলাকায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কোন দিকে যেতে হবে বলে দিচ্ছে, যা এর আগে কখনও দেখিনি। খুবই বিরক্তিকর ছিল যখন, ধরা যাক ২ নম্বর ঘাটে এসে শুনতে হতো, এখানে নয়, ৩ নম্বর ঘাটে যান। অথচ পুলিশের কথামতোই এসেছিলাম ২ নম্বর ঘাটে। এবার জিজ্ঞাসা করার আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশটি পেয়ে মনে হলো, ঘাট-ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে।

উন্নতি যতই হোক, ফেরি পারাপার একটা সেতুর বিকল্প নয়। শেষমেশ পদ্মা সেতু যেখানেই হোক, একটু ঘুরপথে হলেও আমরা চাইব আগাগোড়া সড়কপথেই যাত্রা। আমাদের নদীর খামখেয়ালিপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা অতীতেও পারিনি, ভবিষ্যতেও পারব না; একটা সুস্থির ঘাট, একটা নির্বাঞ্ছিত নদী পারাপার রয়ে যাবে আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

অথচ ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারত। ধরা যাক, আট-দশ ঘণ্টার যাত্রায় মাঝখানে আছে ঘণ্টা দুয়ের নদীপথে যাত্রা—যেমন আরিচা থেকে নগরবাড়ী। ঘাট দু'টির চেহারা ভিন্ন হতে পারত, সব কিছু ছিমছাম, পরিপাটি, আপনার গাড়ি বা বাসযাত্রী হলে আপনার বাসটি, বিনা বাধায় বিনা বিলম্বে জায়গা করে নিল ফেরিতে, আর গালভরা নামের এক ফেরি বোটে আপনি পেলেন ছিমছাম একটি বসার জায়গা, ও কাছেই ধপধপে সাদা টেবিল কুথের একটা ছিমছাম খাবার ঘর। এই যে ছবিটা আঁকলাম, এর পুরোটা কখনও পাইনি। তবে খানিকটা পেয়েছি। বিদেশে পেয়েছি এর পুরোটাই এবং আরও কিছু বাড়তি। সেসব সুখস্মৃতি হয়ে আছে। নটাখোলা-দৌলতদিয়ার ফেরিতে আধ ঘণ্টা সবার জন্য আধ ঘণ্টার এক বিরতিহীন যন্ত্রণা। আর সেই আধ ঘণ্টা যে পুরো এক ঘণ্টা বা তারও বেশি হবে না ঘাটের স্বল্পতার কারণে, তা কেউ বলতে পারে না।

আমাদের হাইওয়েগুলো দেশের জন্য একটা বড়মাপের অর্জন, মানতেই হবে। তবে এই হাইওয়েতে মাথাভারি ট্রাক ও ভাস্কোচোরা চেহারার বাস, মানুষ গাঙ্গাদি ভর্তি-অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, তাপানুকূল ব্যবস্থা সমন্বিত কিছু সংখ্যক কোচ, বা তাপানুকূল না হলেও আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা সমন্বিত বেশ কিছু কোচ, সড়কের মান ও সড়কপথে চলা যানবাহনের মান, দুইয়ের মধ্যে বিস্তারিত ব্যবধান দৃশ্য হিসাবে সুখকর নয়। ব্রিটিশ আমলে রেলওয়ে ব্যবস্থার পিছনে যাত্রীসাধারণের সুখ-সুবিধার চিন্তা কার্যকর ছিল। এ আমলে সড়কপথে যাত্রা বিপুলভাবে বেড়েছে, হাইওয়ের চেহারা পাল্টে গেছে, কিন্তু দীর্ঘ পথে নির্দিষ্ট ব্যবধানে নিয়মিত যাত্রাবিরতির কথা ভাবা হয়নি, যা বাসের চালক ও যাত্রীসাধারণের মৌলিক শারীরিক চাহিদা। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একবার একটা সাধারণ বাসে চড়িয়ে দেশটা ঘুরিয়ে আনলে হয়ত ভাল কিছু হতে পারে।

দশ তারিখে গ্রামের বাড়িতে আমরা মহানগরিক উত্তেজনার আঁচ থেকে বাঁচলাম। টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ কারও মধ্যে দেখা গেল না। বরঞ্চ ব্যঙ্গালোরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্টে ভারতের পরাজয় সংবাদ শুনে মন খারাপ করলাম দু'ভাই। ক্রিকেটে ভারতের সময় ভাল যাচ্ছে না, কবে আবার তেভুলকার খেলায় ফিরবে, সৌরভ গাঙ্গুলী ও সেহওয়াগের ব্যাট ঝলসে উঠবে, হিমালয়ের দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে দ্রাবিড়-এসব ভাবনায়, কথাবার্তায় সময় কাটল।

আমার গ্রামের স্মৃতি সত্তর থেকে পঁয়ষট্টি বছরের পুরনো। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর স্মৃতিও একই ধূসর অতীতের। বহুকাল পরে দেখলাম কৃশকায়া নবগঙ্গা আবার ভরা যৌবনবতী—কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আমার ছেলেবেলার নবগঙ্গা প্রতি বর্ষায় যে রূপ ধরত, বহু বছর যে রূপে তাকে দেখা যায়নি, আবার সেই রূপে তাকে দেখলাম। কিন্তু কেন জানি না, যতটা খুশি হওয়ার কথা তা হইনি। কারণ কি এই যে, আমাদের বিল এবারের বর্ষা তলিয়ে যাওয়ায় ফসল নষ্ট হয়েছে বলতে গেলে পুরোপুরি। গ্রামের সাধারণ

মানুষকে যদি চাল কিনে খেতে হয়, তাহলে কোথা থেকে আসবে চাল কেনার পয়সা, কেউ মুখে না বললেও আমি যেন বাতাসেই সে দুর্ভাবনার খবর পেয়েছি।

গ্রামের হাইস্কুলটির বয়স বছর তিরিশেক, আর একেবারেই বাড়ির নিকটবর্তী যে প্রাইমারী স্কুলটি, তার চলছে এখন ১০০তম বছর। শতবর্ষপূর্তি হবে আগামী বছরে, ২০০৫ সালে। স্কুলের এক শিক্ষক জানানেন, প্রতিষ্ঠা বছর যে ১৯০৫, তার দালিলিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি দেখাবেন আমাকে। আর ইতোমধ্যে স্কুল-ভবনের গায়ে যে সালটি আঁকা আছে-১৯২৫, সেটা মুছে ফেলা হয়েছে। প্রকৃত জন্ম সাল ঘোষণার প্রত্নুতি। সকলের ইচ্ছা, স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিছু করা হোক? এই স্কুলেই আমার লেখাপড়ার প্রথম পর্ব শেষ করেছি আমি। আমি ভাবছি, সমসাময়িক ছাত্র যে ক’জন এখানে ওখানে রয়েছেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করব ও অন্তত এ উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে একত্র হওয়ার চেষ্টা করব।

হাইস্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে চার শ’। আশপাশের গ্রামগুলোতে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটা স্কুল চালু হয়েছে। তাই ছাত্রসংখ্যা তেমন বাড়ছে না। আমি মনে করি, সাড়ে চার শ’ কম নয়। আমি যে তিনটি জিলা স্কুলে পড়েছি, তার কোনটির ছাত্রসংখ্যা তিন শ’ ছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য ওই সময়ে জিলা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবেই সীমিত রাখা হতো। তিনটি জিলা স্কুলেই-দু’টি পশ্চিমবঙ্গে, একটি বাংলাদেশে-এখন ছাত্র সংখ্যা হাজার ছুঁয়েছে বলে জানি। সংখ্যার চাপে শিক্ষার কোমর ভেঙেছে।

কী চাই আমাদের, সমস্যা কোথায়, প্রশ্নের উত্তরে জানলাম, ক্লাসরুমে বেঞ্চের ঘাটতি আছে। একটি কম্পিউটার চাহিদা পূরণ করছে না, আরও একটি হলে ভাল হয়। একতলা বিল্ডিংটি ফ্যাসিলিটিজকে বলেকয়ে যদি দোতলা করা যেত, তাহলে ৩টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম পাওয়া যেত। এবং সেটা স্কুলের কার্যক্রম বাড়াতে সহায়ক হতো।

গ্রামের মানুষ কম্পিউটার চিনেছে! মোবাইল ফোন চিনেছে! একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আনোয়ার তার গ্রামীণ ফোনের সেবা দিয়ে চলেছে গ্রামবাসীদের, এজন্য তার একটা তৃপ্তিবোধ আছে, সকলের কাজে লাগছে তার মোবাইল ফোন। তার নিজেরও রোজগার হচ্ছে, তবে তার সবচেয়ে বড় আনন্দ, নিজের মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী তাকে সে একটা কম্পিউটার উপহার দিয়েছে। এই আশায় যে, মেয়ে একদিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে ও তার কম্পিউটারবিদ্যা তাকে কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। মেয়েটিকে দেখলাম। পিতাপুত্রী একসঙ্গে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল, আমার দোয়া চাইল। এবারের গ্রামযাত্রায় মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে পিতাদের আগ্রহ ও স্বপ্নের পরিচয় পেলাম একাধিক ব্যক্তির মধ্যে-তারা কেউ ধনী নয়, বড়জোর দরিদ্র জগতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। এসব দেখে মনে হলো, আমিও বলতে পারি, সুপ্রভাত বাংলাদেশ। গ্রামের মেয়ে, দশম শ্রেণীর ছাত্রী, তার হাতে এসেছে পার্সোনাল কম্পিউটার!

## জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

### ডা. জোহরা বেগম কাজী

ড. লুৎফুন নাহার

উপমহাদেশে তথা বাঙালী মুসলিম নারী হিসাবে সমাজসেবায় নিবেদিত অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলাদেশে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা ক্ষেত্রে আজকের যে অগ্রগতি, আজ থেকে অর্ধশত বছর পূর্বে তা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের ভূমিকা ছিল খুবই অগ্রতুল। এই রকম একটা স্পর্শকাতর মুহূর্তে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দৃঢ় পদক্ষেপে। নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি তাঁর সারাটা জীবন আত্মমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ পেশায় এসে তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। আজ ১৫ অক্টোবর তাঁর ৯৩তম জন্মদিন।

বাংলাদেশের চিকিৎসা অঙ্গনে ডা. জোহরা কাজী একটা নতুন ভুবন রচনা করে গেছেন। এদেশের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা এবং অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী একসূত্রে গাঁথা। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ডা. জোহরা বেগম কাজীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি। তিনি আমার চোখে শুধু একজন আদর্শ চিকিৎসকই নন, তিনি আমার মাতৃসমতুল্য স্নেহবৎসল সুহৃদজন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ হয় ১৯৫৯ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। আমি তখন এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। মেডিক্যাল কলেজের প্রায় সবাই জানত, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনের গতি চলে তাঁর। তাঁর প্রতিটা কার্যকলাপ ছিল কঠোর সময়ানুবর্তিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্লাস শুরু হবার পর তিনি ক্লাসের দরজা বন্ধ করে দিতেন। এক মিনিট দেরি হলেও কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দিতেন না। যার জন্য সময়মতো সবাই হাজির হয়ে যেত। একটা দিনও তিনি অকারণে ক্লাস কামাই করেননি বা কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকেননি। তিনি সব সময় চাইতেন তাঁর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তাঁর বর্ণিত বিষয়টিকে যেন অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে। এ জন্য তিনি সব সময় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পছন্দ করতেন এবং একজন ছাত্র যতক্ষণ না বুঝত ততক্ষণ তিনি তা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। ডা. জোহরা বেগম কাজী উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা ডাক্তার। এ জন্য তাঁর মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না। কর্মক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে এসে তিনি দৃঢ়হাতে সমস্ত বাধা সরিয়ে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তিনি বাঙালী নারী। শিক্ষা গ্রহণের স্বার্থে তাঁকে এদেশের বাইরে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে লেখাপড়া করতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়ে তিনি একের পর এক হায়ার ডিগ্রী অর্জন করে চিকিৎসা সেবার মানকে উন্নত করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার উগ্র আধুনিকতা তাঁকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার আদর্শ স্থাপন করেছেন বটে, তবে তিনি বাঙালিভূত্বের আদর্শ সব সময় ধারণ করে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এদেশের মোটা সাধারণ শাড়ি পরে তিনি চলাফেরা করতেন এবং কোনরূপ বিলাসিতা ছিল তাঁর নৈতিকতাবিরোধী।

তিনি সব সময়ে সবাইকে উৎসাহ দিতেন মানব সেবা ও মানব কল্যাণের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য। তিনি যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন তখন এদেশের মহিলা রোগীরা পর্দার বাইরে যেত না। “পরপুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেয়ার চেয়ে মরণ ভাল” এটা ছিল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। তাই অপচিকিৎসায়, চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় তারা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত। তিনি এসব দিক লক্ষ্য করে গাইনি বিভাগে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ঢাকা মেডিক্যালে প্রথম ‘স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ’ খোলা হয় যা এদেশের হতভাগ্য নারীদের জীবনে বয়ে এনেছিল চরম আশীর্বাদ।

গাইনি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার পরও তিনি নিরলস পরিশ্রম করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারী রোগীদের খুঁজে এনে এই বিভাগে ভর্তি করে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতেন। তিনি সময় ব্যয় করে ধৈর্য ধরে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির যৌক্তিকতা



বোঝাতেন। কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি দূর করে তাদের ধারণার পরিবর্তন আনতেন। এভাবে তিনি রোগীদের সংগ্রহ করে সেবাদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

তিনি শুধু একজন আদর্শ চিকিৎসকই ছিলেন না, সুচিকিৎসক হবার আদর্শিক পথদৃষ্টা হিসাবে তিনি তাঁর অনুসারীদের মনে স্থান করে নিয়েছেন। একজন চিকিৎসক উচ্চতর ডিগ্রী নিলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন এবং তিনি যেন আশার আলো দেখতেন। এ সমাজের মানুষদের মঙ্গল হবে। তাঁরা ভালভাবে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।

ডা. জোহরা বেগম কাজী নিজে যেমন ছিলেন কর্তব্যপরায়াণ, তেমনি অন্যকেও কর্তব্যপরায়াণতা শিক্ষা দিতেন। তিনি শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের অনেক মূল্যবান জ্ঞান বিতরণ করতেন। তিনি বলতেন, শিক্ষাই জাতিকে উন্নয়ন এনে দিতে পারে। শিক্ষার ছলে তিনি আমাদের সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, মানবসেবা শিক্ষা দিতেন। তাঁর অনুসারী যারা তারা আজও এসব বিষয়ের প্রতি খুবই যত্নশীল। তাঁকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি এবং মাতৃস্নেহের ফলস্বরূপ আমি অবগাহনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। তিনি শুধু সুখের দিনেই নয় দুঃখের দিনেও আমার পাশে মায়ের মতো থেকে জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আমার স্বামী ডা. জামিউল আলম ১৯৭৮ সালের ১০ জুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি হতাশায়-দুর্ভাবনায় ও টেনশনে একেবারে মুষড়ে পড়ি। আর আমার জীবনের এমন একটা দুঃসহ মুহূর্তে তিনি ঠিক মায়ের মতো আমার পাশে এসে দাঁড়ান।

জীবনে যতবার যতরূপে তাঁকে দেখেছি ততই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। আমি দেখেছি গরিব-দুস্থ রোগীদের কাছ থেকে তিনি ফী নিতেন না। তিনি বরং উল্টো রোগীদের ওষুধ কেনার টাকাও দিয়ে দিতেন। কোন রোগীর মৃত্যু সংবাদ শুনলে তিনি রোগীর বাসায় ছুটে যেতেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য দিয়ে, সহযোগিতার হাত বাড়াতেন।

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজীর সেবাদর্শন ছিল সবার থেকে আলাদা। তিনি খুবই স্পষ্টবাদী ও সৎ-আদর্শবান ডাক্তার ছিলেন। তিনি কখনই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি।

একবার তাঁর এক ছাত্র পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে তৎকালীন এক মন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। মন্ত্রীও যথারীতি প্রিন্সিপালকে ফোন করে পাস করানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর বিষয়ে ঐ ছেলেকে কোনমতেই পাস করালেন না। কারণ তিনি তাঁর নীতির বাইরে জীবন গেলেও যেতে পারেন না। মন্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করলে ট্রান্সফারের এবং ভোগান্তির সমূহ ভীতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, যে ছেলে ‘জিরো’ পায় তাকে আমি কখনই পাস করাতে পারব না। এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। এরপর কেউ তাঁকে আর অনুরোধ করার সাহস পাননি।

দিন বদলের হাওয়ায় আজ এই দেশে অনেক নারী ডাক্তার নিজেদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ এমন একদিন ছিল যে, এদেশে নারী ডাক্তার তো দূরের কথা নারী রোগীও চিকিৎসার জন্য খুঁজে পাওয়া যেত না। কত অসহায় নারী পুরুষশাসিত সমাজে ভাগ্যের ওপর নিজেদের সঁপে দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে তার হিসাব লেখা নেই। এই মহীয়সী নারী তাঁর আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ের গুণে সমাজের অন্ধকার দু’হাতে ঠেলে আলোর মশাল জ্বালালেন আর সেই আলোর পথ ধরে এগিয়ে এলাম আমরা, তাঁর অগণিত অনুসারী।

## জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি

### ড. সৌমিত্র শেখর

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার (১৯২১) সঙ্গে যে তিনটি ছাত্রাবাসের নাম সংযুক্ত জগন্নাথ হল তার মধ্যে একটি। অন্য দু’টি মহামেডান হল (বর্তমানে সলিমুল্লাহ হল) ও ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল)। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে মৃত্যু হয় ৩৯ ছাত্র-কর্মচারী-অতিথির, আহত হন শতাধিক। এরপর থেকে ১৫ অক্টোবর ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস’ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

জগন্নাথ হলের যে ভবনটির ছাদ ধসে সেদিন নিহত-আহত হয়েছিল, সেই ভবন ইতিহাসের বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী ছিল। ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাস হিসাবে ঢাকার বালিয়াটির জমিদারদের অর্থ ও উদ্যোগে সেটি নির্মিত হয়। পরে এখানে বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকালে ‘বেঙ্গল পার্টিশান অফিস’ খোলা হয়েছিল এবং ভবনটি বাংলা-সিঙ্গ (৬ নং ভবন) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালে সরকারী অধিগ্রহণের ফলে ভবনটিতে ‘পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস’ খোলা হয়। দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভবনটি তত্ত্বাবধানে নেয় এবং এর নাম হয় ‘পার্লামেন্ট ভবন’। ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই ভবনেই সংসদ সদস্যদের চেয়ার নিক্ষেপে তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জারি হয় আইয়ুব খানের সামরিক আইন। এর আগে অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে (১৯৫২) এই ভবনমুখী ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। তখন এখানে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল। এই অধিবেশন বয়কট করে বের হয়ে এসেছিলেন মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য। এতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এই ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ক্যাম্পাসের অন্যান্য স্থানের মতো এই ভবনেও পাকবাহিনী হত্যাকাণ্ড চালায় এবং ছাত্র-কর্মচারীদের সঙ্গে আবাসিক শিক্ষক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকেও হত্যা করে। স্বাধীনতার পর এই ভবনের নামকরণ করা হয় অনুদ্বৈপায়ন ভবন, আজ যা ‘অক্টোবর স্মৃতি ভবন’ নামে পরিচিত।

প্রাচীন ও ঐতিহাসিক হলেও সময়মতো ভবনটি সংস্কার করা হয়নি। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন দেশব্যাপী স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলন বেগবান, তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিকল্পনায় অন্যান্য ভবনের মতো এই ভবনের সংস্কারের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এই ভবনের সংস্কারে হাত দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সংস্কার পরিকল্পনা যথেষ্ট ছিল না। যে ভবনটির ছাদ ধসে প্রাণহানি ঘটে তা মিলনায়তন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে দেড় শ’ ফুট, প্রস্থে ষাট ফুট অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার বর্গফুট। এর নির্মাণে ছিল চুন ও সুরকির গাঁথুনি আর লোহার রডের বিম। প্রাদেশিক ভবন থাকায় ফ্যান বুলানোর জন্য ত্রিশটি লোহার দীর্ঘ রড ছাদ থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছিল। যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন সেখানে একটি ফ্যানও সংযুক্ত না থাকায় রডগুলো হয়ে ওঠে এক একটি তীরের ফলা। আর এই তীরের ফলায় বিদ্ধ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয় অনেকে। এই ট্র্যাজেডি তৎকালীন সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রণীত বাজেটে শিক্ষা খাত প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে। জগন্নাথ হলের ছাদ ধসের ফলে এ সত্য আরও স্পষ্ট হয়। এর প্রতিক্রিয়া সমাজ-রাজনীতির মতো সাংস্কৃতিক আঙ্গিনাতেও দেখা যায়। ওই সময় আবদুল লতিফের কথা ও সুরে ফকির আলমগীরের কণ্ঠে গাওয়া একটি গান সবার মুখে মুখে ফেরে : ‘মুখের কথা কইতে গেলে তোমরা বল রাজনীতি/ ছাদ ধসিয়া ছাত্র মরে এইটা দেশের কোন্ নীতি’।

১৫ অক্টোবর রাতে ছাত্ররা টেলিভিশনে ‘শুকতারা’ নামের একটি নাটক দেখার জন্য সমবেত হয় মিলনায়তনে। আর তখনই ঘটে সেই দুর্ঘটনা। নিহতরা আজ আমাদের স্মৃতির অঙ্গরে শুকতারা হয়ে জেগে আছে। প্রতিটি অক্টোবরে মনে পড়ে সেই অকাল প্রয়াত মুখচ্ছবি, যারা পড়তে এসেছিল, মরতে আসেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অক্টোবর ট্র্যাজেডি আমাদের সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, সেদিন আহত ছাত্রদের বাঁচাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত ছাত্র-জনতা রক্ত ও অন্যান্য সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। অক্টোবর ট্র্যাজেডি শুধু জগন্নাথ হল বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, এই বিপর্যয় ছিল জাতীয় জীবনের। ভবিষ্যতে দেশের আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে যেন এমন করুণ পরিণতির শিকার না হতে হয়— প্রতিবছর পনেরোই অক্টোবর সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

## বাংলাদেশী মৌলবাদ স্বদেশে ও বিদেশে

শাহরিয়ার কবির

(শেষাংশ)

স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছিল ৭ সেপ্টেম্বর। বৈঠকে অবধারিতভাবে ২১ আগস্টে শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলার বিষয়টি এসেছে। পাকিস্তান/বাংলাদেশ বিষয়ক পরিচালক স্টিফেন এঙ্গেলকেন জানতে চেয়েছেন তদন্তের জন্য এফবিআইয়ের কর্মকর্তারা বাংলাদেশে গিয়েছেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য কী। এর দু’দিন আগে জিন্দা বাজওয়া আমাকে ‘ডেইলি স্টার’-এর একটি খবর (৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৪) ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে দিয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে মৌলবাদীরা কী ভাষায় এফবিআইয়ের প্রতিনিধিদের হুমকি দিয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাকে বললাম, যেখানে সরকারের শরিকরা এফবিআই সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে, যেখানে হামলার পর পরই সরকারীভাবে সমস্ত আলামত নষ্ট করে ফেলা হয়, সেখানে তদন্তের ব্যাপারে এফবিআই সরকারের কোন সহযোগিতা পাবে বলে আমি মনে করি না। এর আগে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর বোমা হামলার পর ব্রিটিশ গোয়েন্দা দল এসেছিল। তারাও খালি হাতে ফিরে গেছে। আমার বিশ্বাস, এফবিআইয়ের প্রতিনিধিদেরও বাংলাদেশ থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে।

কারা এই হামলা করতে পারে এ বিষয়েও আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা। আমি ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে যতটুকু জেনেছি তার ভিত্তিতে বলেছি—আমাদের দেখতে হবে কারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র হত্যা করতে চায়, কারা সেক্যুলার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য ফতোয়া দিচ্ছে, কারা অতীতে এ ধরনের হামলার তদন্ত ধামাচাপা দিয়ে সব সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। উদাহরণ দিয়ে বলেছি, ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা হামলার কয়েক ঘণ্টা পর অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমাকেসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হলো। প্রথমে বলা হলো, আমরাই বোমা হামলা করেছি। তারপর এর সঙ্গে জড়ানো হলো ভারতকে, যেভাবে পাকিস্তান আমলে করা হতো। পরে উচ্চতর আদালতের নির্দেশে মামুন বেকসুর মুক্তি পেলেন, আমার ক্ষেত্রে বোমার হামলা ধোপে টিকবে না বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি বিবিসির চ্যানেল ফোরের সাংবাদিকদের সাক্ষাতকার দেয়ার জন্য দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জড়ানো হলো। ২১ আগস্টের ঘটনার পর যখন পার্থ সাহা নামের এক নিরীহ হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করা হলো তখনই বুঝেছি এবারও ভারতকে জড়ানো হবে এবং বরাবরের মতো প্রকৃত হামলাকারীরা পর্দার আড়ালে থেকে যাবে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে স্টিফেন এঙ্গেলকেন জানতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশে আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে। তাঁকে বলেছি, যে দেশে শেখ হাসিনার মতো নেত্রী নিরাপদ নন সে দেশে আমি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি না। আপনারা বাংলাদেশের নিরাপত্তার কথা ভাবুন, আপনারদের নিরাপত্তার কথা ভাবুন। বাংলাদেশের তেরো কোটি মানুষের জীবন জঙ্গী মৌলবাদের কারণে বিপন্ন। জঙ্গী মৌলবাদ প্রতিহত করা না হলে ১১ সেপ্টেম্বরের মতো ঘটনা আরও অনেক ঘটবে। অর্থনৈতিক অবরোধের প্রসঙ্গ উঠেছিল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায়। যাদের স্বজনরা বাংলাদেশে প্রতিদিন মার খাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে ভিটেমাটি সহায়সম্পদ সবকিছু ফেলে রেখে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তারা প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে এসব ঘটনার বিবরণ ও ছবি দেখছে। তাঁদের কেউ যদি মার্কিন সরকারকে বলেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ না হলে, মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত না হলে খালেদা-নিজামীর সরকারকে কোন সাহায্য দিও না—তখন তাদের যাতনা ও ক্ষোভের গভীরতা আমি বুঝি। বাংলাদেশে মার্কিন সরকার যে অর্থ সাহায্য প্রদান করে সেটা সে দেশের নাগরিকদের ট্যাক্স থেকে পাওয়া। একজন করদাতা নাগরিক নিজের এলাকার জনপ্রতিনিধি বা তার সরকারকে এ কথা বলতেই পারে—তার দেয়া অর্থ যেন তাদের স্বজনদের হত্যা ও নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করা না হয়।

আমি তাদের বলেছি অন্য বিপদের কথা—এতে নির্যাতন বন্ধ হবে না, বরং আরও বাড়বে। প্রথমত, মার্কিন সরকার যেসব দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে সেসব দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে এমন কোন নজির নেই। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে জামায়াত-বিএনপির লোকদের কোন ক্ষতি হবে না, ভোগান্তি বাড়বে গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষের। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, বেকারত্ব বাড়বে, অপরাধ ও হানাহানির পরিমাণ বাড়বে। তৃতীয়ত মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে জামায়াতীরা তখন মার্কিনবিরোধী সংগ্রামের সিপাহসালার হয়ে তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে চাইবে। মৌলবাদীরা এ ধরনের সুযোগ খুঁজছে। তারা জানে স্বাভাবিক নিয়মে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা কখনও ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের সম্ভ্রাসী তৎপরতা বাড়লে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে, বিরোধী দলের আন্দোলনের নিয়মতান্ত্রিক সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে দেশ একটি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে, যা মৌলবাদীদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করবে।

নিউইয়র্ক ও লন্ডনে নির্মূল কমিটির বন্ধুরা জানিয়েছেন জামায়াতীরা কীভাবে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী তরুণদের ভেতর জেহাদীউন্মাদনা ছড়াচ্ছে। প্রবাসে আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম—যাদের জন্ম হয়েছে সে দেশে, যারা কদাচিৎ বাংলাদেশে এসেছে বা কখনই আসেনি, যারা বাংলা বলতে পারে না, বাঙালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অর্জন সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা প্রচণ্ড রকমের আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভুগছে। মানুষ যেখানেই থাক তার নিজস্ব পরিচয়ের একটি অবলম্বন প্রয়োজন। প্রবাসে জন্মগ্রহণকারী বাঙালী তরুণের সংখ্যা এখন কম নয়। এরা অনেকে সেসব দেশে ভোট দেয়, কর দেয়, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক কারণে নিজেকে একজন ইংরেজ বা আমেরিকান ভাবতে পারে না।

প্রবাসী তরুণ বাঙালীদের এই আত্মপরিচয়ের সঙ্কট মৌলবাদীদের জন্য বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা মসজিদে বা বিভিন্ন আলোচনাসভায় কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে বলে—ইসলাম হচ্ছে তোমার ধর্ম, তোমার পরিচয় হচ্ছে তুমি মুসলমান। এরপর তারা বলে বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা কীভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলমানদের শত্রু হিসেবে তারা চিহ্নিত করে অন্য ধর্মাবলম্বী এবং



আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ পশ্চিমের দেশগুলোকে। ইসলামকে রক্ষার জন্য জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলে যে জেহাদে শহীদ হলে তার সকল গুনা মাফ হয়ে যাবে, বেহেশতে তাদের জন্য বিশেষ স্থান হবে।

প্রবাসী তরুণদের মনোজগতে এভাবেই জেহাদী প্রবৃত্তি জমিন তৈরি করছে। আফগানিস্তান থেকে যেসব জেহাদীকে আমেরিকান সৈন্যরা বন্দী করে গুয়ানতানামোর কারাগারে পাঠিয়েছিল সেখানে দু’জন বাংলাদেশী যুবক ছিল, যাদের রিক্রুট করা হয়েছে লন্ডন থেকে, তারা ব্রিটিশ নাগরিক। আমি লন্ডন থাকতেই ইউসুফ ইসলামকে আমেরিকায় যেতে না দেয়ায় মৌলবাদীরা খুব হইচই করেছিল। ইউসুফ ইসলাম হচ্ছে ষাট ও সত্তর দশকের জনপ্রিয় গায়ক ক্যাট স্টিভেনের আরেক নাম। তিনি মুসলমান হয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করছেন। আমেরিকা ও পশ্চিমে ‘ইসলাম বিদ্বেষ’ ও ‘ইসলাম আতঙ্কের’ কথা শুনেছি, যা শুরু হয়েছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে জঙ্গী মৌলবাদীদের বিমান হামলায় নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে। কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারণে ক্যাট স্টিভেনের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গায়ককে আমেরিকায় ঢুকতে দেয়া হবে না—এটা মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ বলেছে—ইউসুফ ইসলাম ফিলিস্তিনের হামাসকে অর্থ সাহায্য করেছেন এবং এর প্রমাণও আছে তাদের কাছে, যে হামাসকে আমেরিকা সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে। লন্ডনে নির্মূল কমিটির আনসার আমাকে ইউসুফ ইসলাম সম্পর্কে আরও তথ্য দিয়েছেন। লন্ডনে পলাতক একাত্তরের অন্যতম যুদ্ধাপরাধী এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার ‘অপারেশন ইনচার্জ’ জামায়াতের চৌধুরী মঈনউদ্দিন ও ইউসুফ ইসলাম লন্ডনভিত্তিক ইসলামিক এনজিও ‘ইসলামিক এইড’-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। জামায়াতীরা সেখানে ক্যাট স্টিভেন ওরফে ইউসুফ ইসলামের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে।

লন্ডন ও নিউইয়র্কে বাঙালীদের বেশির ভাগ মসজিদ কমিটি যে জামায়াতীদের দখলে এ তথ্যও নির্মূল কমিটির বন্ধুরা আমাকে দিয়েছেন। নিউইয়র্কে পলাতক জামায়াত নেতা একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার জল্পাদ হিসেবে পরিচিত আশরাফউজ্জামান খান এখন মুসলিম উম্মাহর নেতা সেজেছেন। ইদানীং জামায়াত নেতাদের ইউরোপ, আমেরিকা সফরের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। গত বছর আমি যখন চীনের মুসলমানদের সম্পর্কে জানার জন্য শিনঝিয়ান গিয়েছিলাম তখন শুনেছি আমার আগে সেখানে সরকারী সফরে গিয়েছিলেন জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী। শিনঝিয়ানে উইগুর মুসলমানদের ভেতর জঙ্গী মৌলবাদীদের তৎপরতায় চীনা সরকার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ইন্টারনেটে দেখেছি শিনঝিয়ানের জঙ্গী মৌলবাদীদের সঙ্গে হরকতুল জেহাদ ও আল কায়েদার সম্পর্ক আছে। গত জুনে রাশিয়ায় মুসলমানদের সম্পর্কে জানার জন্য মস্কো গিয়ে দেখেছি এক বাংলাদেশী জামায়াতী চেচেনদের সাহায্য করার জন্য রীতিমতো এনজিও খুলে বসেছে, টাকা পাচ্ছে সৌদি আরব থেকে। এতে কি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়েছে?

বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যেভাবে তাদের শেকড় দক্ষিণ এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়েছে, বাংলাদেশ সরকার যত অস্বীকার করুক, পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো সবই জানে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বললেন বাংলা ভাইকে প্রেফতার করতে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত বললেন বাংলা ভাইকে প্রেফতার করতে, খালেদার মন্ত্রী নিজামী হেসে উড়িয়ে দিলেন—নাকি বাংলা ভাই নামে কারও অস্তিত্বই নেই, নাকি মিডিয়া সবকিছু সৃষ্টি করেছে! নিজামীর কথার পর খালেদা আর টু শব্দটি করেননি। যাদের বোঝার তারা ঠিকই বুঝে গেছে বাংলাদেশে সরকার আসলে কে চালাচ্ছে।

দেশে ফিরে দেখি জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ দখল এবং তাদের অমুসলিম ঘোষণার হুমকি অব্যাহত রেখেছে। লন্ডনের পার্লামেন্টে লর্ড সভার প্রবীণ সদস্য ‘অল পার্টি হিউম্যান রাইটস কমিটি’র চেয়ারম্যান লর্ড এরিক এভবরি তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত বছর পরিচয় হয়েছিল বাংলাদেশের অকৃত্রিম শুভাকাজক্ষী লর্ড এরিকের সঙ্গে। বাংলাদেশে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বললেন, এ বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁকে বলেছি—আগামী বছর লন্ডনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার উদ্যোগ নিয়েছি। লর্ড এরিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। খালেদা জিয়া ভাবেন আহমদীয়া সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান নির্যাতন, মানবাধিকার পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও অরাজকতার যাবতীয় ঘটনা তিনি তাঁর স্বচ্ছ শিফন শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও সম্প্রদায়কে এতটা অন্ধ ও অপদার্থ ভাবার কি কোন কারণ আছে?

মোল্লা ওমরের তালেবানরা আফগানিস্তানে ফুটবল খেলা বন্ধ করেছিল, যুবকদের শর্ট প্যান্ট পরা উরু দর্শন করলে নাকি আফগানদের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটবে। পাকিস্তানের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী একবাল আহমেদ তাঁর এক সাক্ষাতকারে তালেবানদের যৌনবিকৃতির এই বিবরণ দিয়েছেন। দেশে ফিরে দেখি জামায়াতে ইসলামী ও তাদের মৌলবাদী সহযোগীরা একই যুক্তি দিয়ে মেয়েদের ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ করার জন্য মাতাম শুরু করেছে। এতে কি বিদেশে খালেদা জিয়ার ‘উদার ইসলামী ভাবমূর্তি’ উজ্জ্বল হচ্ছে?

মৌলবাদীদের যাবতীয় হুমকি, সন্ত্রাস ও আতঙ্কলন বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কোন্ চুলোয় ঢুকিয়েছে দেশের বাইরে না গেলে বোঝা যায় না। হুমায়ুন আজাদ প্রশ্ন করেছেন—আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? মুনতাসীর মামুন প্রশ্ন করেছেন—কেন জন্মেছিলাম এই দেশে? আমার প্রশ্ন—আমরা কোন্ বাংলাদেশ রেখে যাচ্ছি আমাদের সন্তানদের জন্য? জানি এ প্রশ্নের জবাব খালেদা জিয়া দেবেন না। শেখ হাসিনা কি দেবেন?

## কলকাতার চিঠি

অমিত বসু

### অদলবদল

বৃষ্টির ছুটি। শরতের নরম রোদ্দুরে উৎসবের গন্ধ। শাহরুখ খানের ঘরে দ্বিমুখী পরব। স্ত্রী গৌরী পুজোপাঠে ব্যস্ত। সঙ্গী শাহরুখ। সহযোগিতায় অসীম নিষ্ঠা। গৌরীকে বলেছেন, দেবী অর্চনায় মন দাও। পুত্র এরিয়ান অবশ্য রোজা রাখতে পারে। ইফতারের আয়োজক গৌরী। অতিথি আপ্যায়নেও তিনি। শাহরুখ যাই বলুন গৌরীর কথা পরিষ্কার, স্বামী-পুত্র সারা দিন না খেয়ে থাকবে। আমি অনু তুলব কোন্ মুখে! শাহরুখের ঘরে ঈদ-পুজো একাকার। ‘টেমপেশন ২০০৪’ উৎসব শেষে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। প্রতিদিন শূটিংয়ের ফাঁকে বাবা-মার সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। কবরস্থানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলছেন। খুশির মুহূর্তে তাঁরা সঙ্গে থাকবেন না তা কি করে হয়! শাহরুখের অনুভবে জনক-জননীর অবস্থান। স্মৃতির রশিতে শক্ত করে বাঁধা।

### চোখে চোখ

বেপরোয়া সুরের বৃষ্টিতে ভিজছে সবুজ ময়দান। গণসঙ্গীতের প্লাবন। রবীন্দ্রনাথের নন্দন প্রাঙ্গণে গানের আগুন আকাশ ছুঁচ্ছে। বিশ্বনন্দিত শিল্পী টমি স্যাভসের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হাতে ধরলেন দোতারা। নরম করে তারে আগুল ছোঁয়ালেন। স্ত্রিং নয়,

যেন ফুলের পাপড়ি। পিট সীগার আসতে পারেননি, অসুস্থ। নাতি রডরিগস উপস্থিত। প্রথম গণসঙ্গীত তার। সলিল চৌধুরী মঞ্চে অবিরাম গান। বব ডিলান, হ্যারি বেলাফন্টে পিট সীগার একা গেয়েছেন। একসঙ্গে মেলায় গাইলে কী হতো! সঙ্গীতের সুরভিতে বারুদের গন্ধ মোছার লড়াই। পরাজয়ের জ্বালা থেকে প্রতিবাদের স্কুলিঙ্গ। হার না মানার শপথ। ভাষায় শব্দের জোয়ার-‘হাতে হাত, চোখে চোখ, বন্ধুত্বের বিস্তার, নেই তফাত।’ অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরার শিল্পীদের নামতে দেয়া হচ্ছে না মঞ্চ থেকে। থামার অনুমতি নেই। দুর্বল ফুসফুসে সুরের প্রবল হাওয়া।

## ৮ নবেম্বর

লোকসভায় প্রথম বাঙালী স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মর্মান্বিত। বিরোধীদের কাণ্ডকারখানায় ব্যতিব্যস্ত। গণতন্ত্র শক্ত করার দায়িত্ব কি কেবল শাসক দলের! বিরোধীরা উড়ে বেড়াবেন ইচ্ছামতো। রেল বাজেট, সাধারণ বাজেট বিনা আলোচনায় পাস হলো। বিজেপি বাইরে বাজার গরম করল। লোকসভায় এলো না, এ কেমন কথা! নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এ কী আচরণ! ৮ নবেম্বর দিল্লীতে সব রাজ্যের স্পীকারকে ডেকেছেন। সাংসদ-বিধায়কদের দায়িত্বসচেতন করার দাওয়াই খোঁজা হবে। সোমনাথ বলেছেন, বিজেপি জোট যা করছে সেটা নতুন নয়। ১৯৯১ ও ১৯৯৯তে একই রকম ঘটেছিল। লোকসভা ও বিধানসভায় আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তিনটি আসনের উপনির্বাচনের ফল বেরোবে। শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, এন্টালি। সিপিএম তিনটিতেই জিতবে মনে করছেন সোমনাথ। তবে বিধায়ক হয়েই যেন বিধানসভার কথা না ভোলেন। সাবধানবাণী সোমনাথের।

## অন্য রাস্তা

প্রাণপণ প্রয়াসেও পাঠককে বেঁধে রাখতে পারেন না লেখক। ভাষার ঠোঁটের খেয়ে অন্য রাস্তায় ছিটকে যায়। গড়ে নেয় ভিন্ন জগত। দার্শনিক জ্যাক দেরিদা দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন কথাটা। ভাষা ও ভাবের বিনির্মাণ তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটিয়ে বিশ্বকে সচেতন করেছিলেন। এবার সব ভুলে নিজেই চলে গেলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাঙালী মননে দেরিদার প্রাণ প্রবল। প্রতিটি গ্রন্থ হীরকখণ্ডের মতো আলোর উৎস। ‘অফ গ্রামাটোলজি’, ‘এ্যাডিউ’, ‘বাই ফোর্স অব মোর্নিং’, ‘আই উইল হ্যাভ টু ওয়াভার এ্যালোন’ বাংলায় অনূদিত। আলজিরিয়ার এল বায়ার শহরে জন্ম ১৯৩০-এ। ১৯৫২তে প্যারিসে দর্শন শিক্ষা। জন্ম হপকিনস ইয়েল, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে বন্দী করা যায়নি। দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বিশ্ব। লেখকের ওপরে জায়গা দিয়েছেন পাঠককে। বলেছেন, লেখককে পাঠ নিতে হবে পাঠকের কাছে। নইলে অসম্পূর্ণ চিন্তার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে।

## সত্যি মিথ্যে

বিচ্ছেদের পর গোবিন্দর স্ত্রী সুনীতা বলেছেন, পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কিছু নেই। গল্প উপন্যাস সিনেমায় মিথ্যে প্রেমের গল্প ফাঁদা হয়। কাউকে বিশ্বাস করলে আজীবন জ্বলতে হবে। লোকসভা নির্বাচনে জিতে গোবিন্দর নতুন পাখা গজিয়েছে। রানী মুখার্জির সঙ্গে থাকছেন। রানী গোবিন্দকে মোটেও ভালবাসেন না। আখের গোছানোর গল্প। মীরা নায়ারের ছবিতে চাম্প পেয়ে ধরাকে সরাঙান করছেন রানী। অন্যের ঘর পোড়ালে নিজের মঙ্গল হয় না। বুম্পা লাহিড়ীর পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া উপন্যাস ‘ইন্টারপ্রেটার ম্যালাডিস’ নতুন ছবির ভিত। হলিউডে মীরার ‘ভ্যানিটি ফেয়ার’ সাড়া ফেলেছে। ‘যুবা’ ছবিতে রানীকে দেখে মুগ্ধ। মীরার নতুন নায়িকা রানী আমেরিকা ছুটে বেড়াচ্ছেন। কর্মকাণ্ডের শেষ নেই। সুনীতা ধর্মস্থানে ধর্ণা দিচ্ছেন। বলেছেন, আমি কারও অকল্যাণ কামনা করি না। শুধু জানতে চাইছি আমার সর্বনাশের কারণ। কপাল পুড়ল কোন্ অপরাধে। আর শেষ প্রশ্ন, নিজের ঘর জ্বালিয়ে গোবিন্দ দেশের উপকার করেন কিভাবে?